গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২২ সংখ্যা | ৭ - ১৩ জানুয়ারি ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কৃষকরা নয়, কৃষিঋণ পাচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা

কৃষক আন্দোলনের দাবি মানার ঘোষণা করতে গিয়ে কৃষকদের দুঃখে নাকি চোখের জলই ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী! কৃষকদের ভাল করতে চেয়েও তাঁদের 'বোঝাতে না পারা'র দুঃখ তিনি উগরে দিয়েছেন টিভির পর্দায়। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি সরকার দেশের কৃষকদের ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার নামে আসলে কাদের হাতে জনগণের গচ্ছিত টাকা তুলে দিয়েছে?

'দ্য ওয়ার' সংবাদমাধ্যম ২০১৮ সালে তথ্যের অধিকার আইনে প্রশ্ন করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে জেনেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো ৫৮ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা কৃষিঋণ দিয়েছে মাত্র ৬১৫টি অ্যাকাউন্টে। অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৯৫ কোটি টাকা ঋণ গেছে এই 'কৃষকদের' কাছে। এর মধ্যে কেউ কেউ পেয়েছে ১০০ কোটি টাকারও বেশি।

বর্ধমান স্টেশনের ওয়েটিং রুম বেসরকারিকরণ করার বিরুদ্ধে ৩০ ডিসেম্বর নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের বর্ধমান শাখার পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়

১০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে যারা, তারা কেমন কৃষক? এই 'কৃষক'দের মধ্যে আছে আম্বানিদের রিলায়েন্স ফ্রেস, আছে আদানি, গোয়েঙ্কা, টাটা এমন সব একচেটিয়া মালিকদের পরিচালনায় চলা বৃহৎ কৃষি কোম্পানি।

এই সংবাদমাধ্যমই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে রাজ্যভিত্তিক কৃষিঋণের তথ্য চাইলে এই ব্যাঙ্কের মুম্বই জোন ছাড়া আর কোনও জোন তথ্য দেয়নি। দেখা যাচ্ছে মুম্বই শহরের সবচেয়ে ধনী এলাকায় স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা তিনটি অ্যাকাউন্টে কৃষি ঋণ দিয়েছে ২৯.৯৫ কোটি টাকা। আর ২৭ কোটি টাকা দিয়েছে ৯টি অ্যাকাউন্টে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা আছে কৃষিঋণ মানে— কৃষক যে ঋণ নিয়েছে বা ঋণের টাকা পেয়েছে। তথ্য দেখাচ্ছে স্বল্প সুদের এই কৃষিঋণ গেছে একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের কোম্পানিগুলির কাছেই। এই হল কৃষক দরদের নমুনা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জোর গলায় বলে চলেছেন, কৃষকদের আয় তিনি দ্বিগুণ করে দেবেন। আর তার জন্যই নাকি তিনটি কৃষি আইন তিনি এনেছিলেন। কৃষক আন্দোলনের জোয়ারের সামনে আপাতত তা থেকে পিছু হটলেও তাঁরা যে কৃষিকে সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া মালিকদের হাতে তুলে দিতেই বদ্ধপরিকর তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ জন্য যে কোনও ভাবে হোক না কেন আপাতত বাতিল করতে বাধ্য হওয়া তিন কৃষি আইন কিংবা পারলে তার থেকেও মারাত্মক আইন কৃষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য যে সরকার ওৎ পেতে আছে, তা কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর কথাতে স্পষ্ট হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি আইন আনার অনেক আগে থেকেই একচেটিয়া মালিকদের কর্পোরেট কোম্পানিগুলি কৃষি ফসল কেনা, গুদামজাত করা, তার সামগ্রিক ব্যবসার বিশাল পরিকাঠামো নির্মাণ শুরু করে দিয়েছিল, একথা আজ জানা। তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই কর্পোরেটদের নির্দেশেই সরকার তিন কৃষি আইন এনেছে।

এখন দেখা যাচ্ছে, কৃষিঋণের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সাধারণ মানুষের টাকা আসলে ঢালা হয়েছে একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের কৃষিপণ্য পুরোপুরি কুক্ষিগত করার পরিকাঠামো নির্মাণে। তার সাথে ঢালা হয়েছে বড় বড় শপিং মল রিটেল চেনের ব্যবসায়, যে সব মলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাদের ছাপ মারা প্যাকেটবন্দি কৃষিপণ্য বিক্রি করবে। ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, বিগবাস্কেট ইত্যাদি নামে তারা কাঁচা সবজি, মাছ ইত্যাদি

দুয়ের পাতায় দেখুন

কোভিড নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা প্রকট

ইংরেজি নববর্ষের আগমন ঘটল কোভিড সংক্রমণের ব্যাপক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে গত ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে দৈনিক সংক্রমণ ছিল ২ হাজারের ঘরে, জানুয়ারির ২ তারিখের মধ্যে তা দৈনিক ৬ হাজার ছাড়িয়েছে। সারা ভারতে গত এক সপ্তাহে ১ লক্ষ ৩০ হাজার নতুন সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। যত সময় যাচ্ছে বৃদ্ধির হার ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

এমনটা যে ঘটতে চলেছে তা কি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অজানা ছিল? একেবারেই তা নয়। চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বেশ কিছুদিন ধরেই এই হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিলেন। তবু সরকারের হুঁশ ফেরেনি। কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে শাসকদল এবং অন্য বড় দলগুলিও যথেচ্ছভাবে কোভিড বিধি ভাঙার পর আশঙ্কা বাড়ছিলই। এরপর পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নিজে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট সহ অন্যত্র বড়দিন এবং বর্ষবরণের নামে হুল্লোড়ে প্রবল উৎসাহ দিয়েছেন। ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত বিধিনিষেধও শিথিল করে দেওয়ায় ভিড় উপচে পড়েছে রাস্তাঘাট ও নানা বিনোদন কেন্দ্রে। প্রায় কারও মুখে মাস্ক নেই, দূরত্ব মানার প্রচেষ্টা নেই, মানানোর জন্য প্রশাসনিক সদিচ্ছার তো আরও অভাব। এই বাঁধনহারা অব্যবস্থাই কোভিড বিপদ বাড়িয়ে তুলল। *সাতের পাতায় দেখুন*

বিদ্যুৎ আইন ২০২০ বাতিলের দাবিতে
মধ্যপ্রদেশে গ্রাহক কনভেনশন

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে জেলা কনভেনশন। প্রধান অতিথি 'বিদ্যুৎ মণ্ডল পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি এস কে জয়সওয়াল ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আজ যখন বিদ্যুৎ বিভাগের শক্তিশালী পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকা লাভ হচ্ছে, তখন তাকে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন সমন্বয় কমিটির সদস্য ও প্রধান বক্তা লোকেশ শর্মা বলেন, রাজ্যের বিদ্যুৎক্ষেত্রকে আদানি পাওয়ার ট্রান্সমিশনকে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার আদানিকে ৩৫ বছরের জন্য বিদ্যুৎ ক্ষেত্র দিয়ে দিচ্ছে মাসে মাত্র ১ টাকা লিজে। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ নিয়ে আসে। এখন সরকার এই আইনটি সংশোধন করে বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী) ২০২১ আনছে, যাতে সরকার ভর্তুকি পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে। ফলে বিদ্যুৎ পণ্যে পরিণত হবে, বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি তাদের ইচ্ছেমতো দাম বাড়াবে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার জন্য মধ্যপ্রদেশ বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সমন্বয় কমিটির সদস্য রচনা আগরওয়াল ২০ সদস্যের একটি কমিটি ঘোষণা করেন। সভা পরিচালনা করেন রূপেশ জৈন। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম পি গোস্বামী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ।

কৃষকরা নয়, কৃষিঋণ পাচ্ছে একচেটিয়া মালিকরা

একের পাতার পর

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অনলাইন ব্যবসা করবে। এ জন্যই ব্যয়িত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অধিকাংশ কৃষিঋণ।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, কৃষিঋণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সুদ নেয় মাত্র ৪ শতাংশ। ফলে নামমাত্র সুদে বৃহৎ কোম্পানিগুলি এই ঋণের টাকায় তাদের আখের গুছিয়েছে। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ফসল নষ্ট হলে যখন কৃষিঋণ মকুব করার দাবি ওঠে এবং কিছু মকুবও হয়, তখন তার ষোল আনা লাভ কৃষকের পরিবর্তে এই পুঁজিপতিরাই পেয়েছে। ২০১৮-১৯ সালে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বলেছিল, ১১ লক্ষ কোটি টাকা কৃষিঋণ দেবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুসারেই শুধু আরটিআইতে যেটুকু জেনেছে 'দ্য ওয়ার', তার বাইরেও নানা পথে কৃষিঋণের বড় অংশের টাকা গেছে একচেটিয়া মালিকদের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা একাধিকবার দেখিয়েছে, ১৯৯০ সালে অর্থনীতির উদারিকরণ, বিশ্বায়ন শুরু হওয়ার পর থেকে যত দিন গেছে সরকারি তরফে ক্ষুদ্র কৃষিঋণ কমেছে, বৃহৎ ঋণ বেড়েছে। ২০১৪ থেকে বিজেপির আমলে সরকারি কৃষিঋণের মাত্র ১৪ শতাংশ গেছে .০১ হেক্টরের থেকে কম জমির মালিকদের কাছে। ২৪ শতাংশের বেশি গেছে সেই কৃষকদের কাছে যারা ১০ লক্ষ টাকার বেশি বিনিয়োগ করতে পারে। অথচ একেবারে ক্ষুদ্র কৃষকরাই মহাজনী ঋণের জালে পড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের ঘরে চাষে খাটানোর মতো টাকা থাকেই না। সরকার সহজে ঋণ ও সহায়তা না দিলে তাদের পক্ষে চাষ করা তো দূরের কথা বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৮.০২.২০১৯)

ঐতিহাসিক কৃষি আন্দোলনের সময় সারা ভারতে জনগণ কৃষকদের অন্নদাতা বলে সম্মান জানিয়েছে। সেই কৃষকদের পরিস্থিতি কী তা কারও অজানা নয়। সার, বীজ, কীটনাশক, সব ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি, ডিজেল, বিদ্যুৎ সবকিছুর দাম বাড়ায় ফসল ফলানোর খরচ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এদিকে বাজারে সাধারণ ক্রেতার জন্য চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, সবজি, ভোজ্য তেলের দাম যতই বাড়ুক না কেন, চাষি যখন বাজারে ফসল বেচতে যায় তখন ফসলের দাম থাকে সবচেয়ে কম। সাধারণ চাষির পক্ষে কৃষিকে ক্রমাগত অলাভজনক করে তোলার জন্য একটা বিশাল চক্র কাজ করে চলেছে। মাঝে মাঝে কিছু ছোটখাটো ফড়ে, মহাজনদের বিরুদ্ধে সরকারি দলগুলি কথা বললেও যে বড় বড় পুঁজি-মালিকরা বাজারের উপর তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের জোরে কৃষি ফসল নিয়ে এখনই যে ফাটকা খেলছে, ইচ্ছামতো মজুত করে এবং বাজারের দামকে সরাসরি কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে বা কমিয়ে ইতিমধ্যেই সাধারণ চাষিকে জমি-ছাড়া করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তা সরকার জানে না তা নয়। নাসিকের পেঁয়াজ চাষি কিংবা পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষিদের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা এই চক্রের কারসাজি খুবই ভাল জানেন।

সম্প্রতি সরষের তেল, সাদা ভোজ্য তেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় বড় কোম্পানিগুলির কারসাজি কত সর্বনাশা হতে পারে তা মানুষ দেখেছে। তারা ফসল ওঠার সময় কৃষকদের থেকে তৈলবীজ কিনেছে সামান্য দামে। তারপর বেআইনিভাবে তা বিপুল পরিমাণে মজুত করেছে, তারপর বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে সুযোগ বুঝে তেলের দাম দ্বিগুণ-তিনগুণ করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাড়ছে কৃষকের আত্মহত্যা।

জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০২০-তে কৃষির সাথে যুক্ত ১০ হাজার ৬৭৭ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক ৫৫৭৯ জন, ভূমিহীন ভাগচাষি ও খেতমজুর ৫০৯৮ জন। (টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২৯.১০.২০২১) যদিও কি রাজ্য কি কেন্দ্র কোনও সরকারই বেশিরভাগ চাষির আত্মহত্যার কারণ হিসাবে এই দুর্বিষহ কৃষি পরিস্থিতির কথা স্বীকারই করে না। পারিবারিক অশান্তি, অভাবের কারণে আত্মহত্যা বলে চালায়। পুলিশে চাষির আত্মহত্যা বলে রেকর্ড হয় আসল ঘটনার অতি সামান্য অংশ। তাতেও দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক দিন ২৯ জনের বেশি অর্থাৎ প্রত্যেক ঘন্টায় একাধিক চাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে জীবনের জ্বালা জুড়োচ্ছেন।

এই যখন অবস্থা, সে সময় সরকার এবং তার পরিচালনায় থাকা ব্যাঙ্কগুলোর কাজ ছিল না কি অনেক বেশি ক্ষুদ্র, মাঝারি কৃষক, ভূমিহীন বার্গাদার, ভাগচাষি, কৃষির উপর নির্ভরশীল খেতমজুরদের জন্য অতি সহজ শর্তে, বিনা সুদে ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করা? প্রয়োজনে কৃষি মজুরির সরাসরি দায়িত্ব নেওয়া? কৃষকদের সার-বীজ-কীটনাশক কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া মালিকদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে এইগুলি এবং অন্য সমস্ত কৃষি উপকরণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ-ডিজেল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরকারি উদ্যোগে সস্তায় কৃষকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করাই ছিল জরুরি। কিন্তু দেখা গেল সরকার হেঁটেছে ঠিক তার বিপরীত পথে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার যে তিনটি কৃষি আইন এনেছে তার প্রধান অভিমুখই হল কৃষি ক্ষেত্রে কর্পোরেট মালিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল বিজেপি থেকে শুরু করে তাঁর বিরোধী সংসদীয় সব দলই কৃষিঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদিও ভোট মিটে যেতেই তাদের কারও এ বিষয়ে বিশেষ মাথাব্যথা দেখা যায়নি। একচেটিয়া পুঁজি মালিক কর্পোরেট কোম্পানির টাকায় চলা সংবাদমাধ্যম এবং ভোটবাজ সংসদীয় দলগুলি মাঝেমাঝেই একটা ধুয়ো ধরে— সমস্ত ক্ষুদ্র-মাঝারি কৃষিঋণ মকুব করলে অনাদায়ী ঋণের চাপে ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর প্রবল চাপ বাড়বে। সরকারি তহবিলের উপরেও চাপ পড়বে, যা অর্থনীতির ক্ষেত্রে নাকি সমস্যা সৃষ্টি করবে। কথাটা যে কত বড় মিথ্যা, তা দেখা যায় সরকারের দেওয়া হিসাবেই। ১০টা রাজ্য সরকার মিলে ২০১৮-তে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদিও এর কত শতাংশ বাস্তবে তারা মকুব করেছে তার তথ্য ঠিকমতো সরকার দেয়নি। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বদান্যতায় ওই বছরেই মাত্র ১২টি বৃহৎ কর্পোরেট কোম্পানি ঋণ ফেরত না দেওয়ায় ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদ দাঁড়িয়েছিল ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। যা 'রাইট অফ' অর্থাৎ খাতা থেকে মুছে দিয়েছে সরকার (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৮.০২.২০১৯)।

কৃষকদের উন্নতির অজুহাত দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বকলমে একচেটিয়া মালিকদের হাতে জনগণের গচ্ছিত সম্পদ তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার আবারও দেখিয়ে দিল এই দেশের সরকার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সমস্ত শাসনব্যবস্থা আসলে কাদের তাঁবেদারি করে। একচেটিয়া মালিকদের সেবাদাস হিসাবে কখনও বিজেপি, কখনও কংগ্রেস যে-ই কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের গদিতে যাক না কেন, তাদের কাছে আজ ভোটের অর্থেও জনগণের কোনও দাম নেই। তারা জানে টাকার জোরই হচ্ছে আসলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রধান জোর। শ্রমিক, কৃষক থেকে শুরু করে সমাজের সমস্ত স্তরের খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি আজ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সরকারের কোনও দায় নেই। এই পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে দিল্লির সীমান্তে চলা ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত নখ-দাঁত এবং কর্পোরেট মালিকদের টাকার থলি ও প্রচারমাধ্যমের মোকাবিলা করে কীভাবে সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য দাবি করতে পারে। এই পথেই কৃষকদের প্রতি সরকারের প্রতারণাকে মোকাবিলা করতে হবে। আগামী ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশ জুড়ে খেটে-খাওয়া মানুষের দাবি নিয়ে সাধারণ ধর্মঘটে এজন্যই সামিল হবেন সমস্ত কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুব সহ সব পেশা সর্বস্তরের জনগণ।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন পরীক্ষা
আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণই উদ্দেশ্য

২৬ নভেম্বর ইউজিসি একটি চিঠিতে দেশের ৪৫টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির জন্য অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছে। চিঠিতে উপাচার্যদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) -র মাধ্যমে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থার নির্দেশ আছে। ওই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে যে, এনটিএ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিজ্ঞান, মানবীবিদ্যা, ভাষা, কলা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রধান, সুদক্ষ ও স্বশাসিত পরীক্ষা গ্রহণের সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এমন পরীক্ষা ব্যবস্থার কথা জাতীয় শিক্ষানীতিতে থাকলেও এ বছর তারা কেবল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই সুযোগ দেবে, যদিও ইচ্ছুক রাজ্য বেসরকারি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তা গ্রহণ করতে পারবে। স্নাতক-স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি নেওয়া সম্পূর্ণভাবে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়।

ফলে কেমনভাবে ভর্তির সেই পরীক্ষা নেওয়া হবে, প্রশ্নপত্র কেমন হবে, মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে এবং পরীক্ষান্তে মেধা তালিকা, যার ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, তা প্রস্তুত কেমনভাবে হবে এই সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্থাগুলির উপর অর্পিত।

এনটিএ-র মতো বাইরের কোনও সংস্থা যদি সেই অধিকারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে তা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ। উপরন্তু, পঠন-পাঠনের বিষয়, শিক্ষণের গুণমান, শিক্ষার্থীদের মান— এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন। এ সম্পর্কে যাঁদের সামান্যতম ধারণা আছে তাঁরা জানেন এগুলি রাজ্য ও স্থানীয় প্রয়োজনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই শহর এবং শিল্পাঞ্চলের একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সঙ্গে মফঃস্বল বা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার প্রতিষ্ঠানের তারতম্য অনেক। ছাত্ররা যে অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উঠে আসে তার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক আছে তার কথা বাদই থাকল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক এই সমস্ত বৈচিত্র ও তারতম্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ এনটিএ-র মতো কোন প্রতিষ্ঠান যদি সবার জন্য একই প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব নেয় তাহলে তার সীমাবদ্ধতা কতটা পর্বতপ্রমাণ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এনটিএ চালু হলে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর, বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্ররা যাঁরা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়া ও গবেষণা করার স্বপ্ন দেখছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হয় তার তুলনায় সর্বভারতীয় পরীক্ষা স্বাভাবিকভাবে অনেক প্রতিযোগিতামূলক হবে এবং তাতে ভালো ফল করা দুষ্কর হবে। উপরন্তু, এই তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যাঁরা মেধা তালিকায় নাম তুলতে পারবেন তাঁরা নিজেদের জেলায় বা রাজ্যের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সুযোগ পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। কারণ মেধা তালিকা হবে দেশজুড়ে যত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সবার জন্য। ফলে তাঁকে হয়ত ভর্তির জন্য এক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর এক জায়গায় বা অন্য রাজ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে।

অন্যদিকে যিনি সে সুযোগ পাবেন না তিনি ভাববেন, যোগ্যতা নেই বলেই পারেননি, হয়ত বা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিরস্ত হবেন। অন্যদিকে সরকারকেও ভর্তি করানোর দায়িত্ব নিতে হবে না। মেডিকেলে ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে যে 'নিট' পরীক্ষা চালু হয়েছে তার ফলে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ কীভাবে মূলত খুবই অল্প সংখ্যক বিত্তশালী পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের হাতে গিয়ে জমা হয়েছে তা সকলেরই জানা। এবার সব বিষয়ে অভিন্ন পরীক্ষা চালু করে কি কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়?

আসলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর কঠোর প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের লক্ষ্য। এরই ফলে তাদের 'এক জাতি, এক প্রবেশিকা পরীক্ষা' চালু করা সহজ হবে। কেবল শিক্ষা কেন, জীবনের সব ক্ষেত্রে বহু ভাষা-ভাষী, বহু জাতি, বহু সংস্কৃতি বিশিষ্ট এই দেশে কোনও বৈচিত্র্য থাকুক তা বিজেপির না-পসন্দ। সবাইকে এক ছাঁচে তারা ঢালতে চাইছে। এটাই তাদের মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ তে তারা এই দৃষ্টিভঙ্গি এনেছে। এই নীতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর মতবাদ

ভ ই লেনিন

মানবমুক্তির দর্শন হিসাবে মার্কসবাদকে জানতে ও বুঝতে দলের মধ্যে আদর্শগত চর্চার যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলছে তার সহায়ক হিসাবে আমরা কার্ল মার্কসের জীবন ও মার্কসবাদ সম্পর্কিত লেনিনের লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এবার তৃতীয় কিস্তি।

(৩)

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

পুরনো বস্তুবাদের অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা দেখে মার্কস নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'বস্তুবাদের ভিত্তির সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং সেই অনুসারে তাকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন'। বস্তুবাদ সব সময়ই চেতনাকে ব্যাখ্যা করে বাস্তব বস্তুসত্তার ফলাফল হিসাবে, এবং দেখায় এর বিপরীতটা সত্য নয়। তাই মানুষের সামাজিক জীবনে বস্তুবাদ প্রয়োগ করা হলে সামাজিক চেতনাকে সামাজিক বাস্তবের ফলাফল হিসাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে। মার্কস লিখেছেন (পুঁজি, খণ্ড ১) ঃ 'উৎপাদনের হাতিয়ার এবং তার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদানপ্রদানের ধরন। উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ তার জীবন বাঁচিয়ে রাখে। এর মধ্য দিয়েই জন্ম নেয় সামাজিক সম্পর্কগুলি, তার থেকেই গড়ে ওঠে মানসিক ধারণার ধাঁচাটি। মানবসমাজ ও মানব ইতিহাসের ওপর প্রয়োগ করা বস্তুবাদের মূলনীতিগুলির পূর্ণাঙ্গ সূত্র মার্কস তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনায় অবদান প্রসঙ্গে' রচনার ভূমিকায় এইভাবে দিয়েছেন ঃ বেঁচে থাকার উপকরণগুলি সামাজিক ভাবে উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ এক অপরিহার্য এবং তার ইচ্ছা নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে প্রবেশ করল— তা হল উৎপাদন সম্পর্ক। এই সম্পর্ক মানুষের বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সেই নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই সব উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সমষ্টি থেকেই গড়ে ওঠে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, যা হল বাস্তব ভিত্তি। এর উপর ভর করে একটি আইনি ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে এবং যা সমাজচেতনার একটি নির্দিষ্ট রূপের সঙ্গে খাপ খায়। জীবনধারণের বস্তুগত উপাদানগুলির উৎপাদনের পদ্ধতিটি সাধারণ ভাবে মানবজীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিগত পদ্ধতিটিকে স্থির করে দেয়। মানুষের চেতনা তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না, বরং বিপরীত ভাবে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনা নির্ধারণ করে। বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে এসে, সমাজের বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তিগুলির সংঘাত বাধে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে। অথবা ওই একই কথা আইনের ভাষায় বলতে গেলে, যে সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তিগুলি এতদিন ক্রিয়াশীল ছিল, সংঘাত বাধে তার সঙ্গে। উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশের একটা রূপ

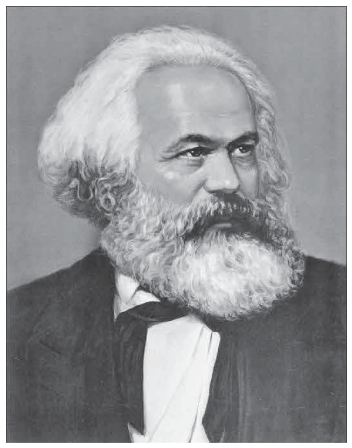

থেকে এই সম্পর্ক পরিণত হয়ে যায় তার শৃঙ্খলে। তখনই শুরু হয়ে যায় সামাজিক বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুলাকার উপরিকাঠামোর পুরোটাই কম-বেশি দ্রুত গতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রূপান্তরগুলি বিচার করার সময় আমাদের সর্বদাই পার্থক্য করতে হবে— উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার বস্তুগত পরিবর্তন— প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নির্ভুলতায় যা নির্ণয় করা যায় এবং আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক বা দার্শনিক, সংক্ষেপে মতাদর্শগত রূপগুলি, যার মধ্য দিয়ে মানুষ এই সংঘর্ষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার নিষ্পত্তি ঘটায়— এই উভয়ের মধ্যে ।

একজন মানুষ নিজের সম্পর্কে যা ভাবে, তার ওপর ভিত্তি করে যেমন আমরা তার সম্পর্কে মতামত গড়ে তুলি না, তেমনই রূপান্তরের এমন একটি সময়কালকে তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে আমরা বিচার করতে পারি না। বরং, এই চেতনার ব্যাখ্যা হওয়া উচিত বরং বস্তুগত জীবনের দ্বন্দ্বগুলি দিয়ে, সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব দিয়ে। ...'

'মোটামুটিভাবে এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদনপদ্ধতিগুলিকে সমাজের অর্থনৈতিক নির্মাণের ধারাবাহিক পর্যায় হিসেবে ধরা চলে।' (১৮৬৬ সালের ৭ জুলাই এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠিতে মার্কসের সংক্ষিপ্ত বিবরণের সঙ্গে তুলনীয় ঃ 'উৎপাদনের উপায়গুলির নিরিখেই সংগঠিত হয় শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রগুলি— এই আমাদের তত্ত্ব।')

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার আবিষ্কার, কিংবা আরও সঠিক ভাবে বললে, সামাজিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে বস্তুবাদের সুসঙ্গত ধারাবাহিকতা ও প্রসার আগেকার ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলির দুটি প্রধান ত্রুটি দূর করেছিল। প্রথমটি হল, খুব বেশি হলে এইসব তত্ত্ব মানুষের ঐতিহাসিক কার্যকলাপের পিছনে মতাদর্শগত প্রেরণাগুলি কী, তা অনুসন্ধান করেছে, এইসব প্রেরণার উৎস কী— তা অনুসন্ধান করেনি। সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থাটির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে যে বাস্তব নিয়মগুলি— তা নির্ধারণ করেনি। বস্তুগত উৎপাদনের মাধ্যমে বিকাশের মাত্রায় পৌঁছনো এই সম্পর্কগুলির উৎসের দিকে চোখ রাখেনি।

দ্বিতীয়ত, আগেকার তত্ত্বগুলি অধিকাংশ জনগণের কার্যকলাপকে বিচারের মধ্যে আনেনি। সেখানে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদই প্রথম জনজীবনের সামাজিক অবস্থা ও তার পরিবর্তনগুলি বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুলতার সঙ্গে চর্চা করছে। প্রাক-মার্কসবাদী 'সমাজবিদ্যা' ও ইতিহাস-রচনা বড় জোর সামনে এনেছিল যথেচ্ছভাবে সংগ্রহ করা কাঁচা তথ্যের রাশি এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার আলাদা আলাদা দিকগুলি। মার্কসবাদ পরস্পরবিরোধী সমস্ত প্রবণতার সামগ্রিকতা বিচার করল, সেগুলিকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির জীবনযাত্রা ও উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাযোগ্য অবস্থায় দাঁড় করালো। কোনও একটি ধারণা কেন বিশেষ ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে তার বিচার করল এবং শেষ পর্যন্ত এ সত্য দেখাল যে কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল ধারণা ও প্রবণতার উৎস হচ্ছে বস্তুগত বিষয়গুলির উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে। একটি সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ও বিনাশের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে কীভাবে বিচার করতে হয় তা মার্কসবাদ দেখিয়েছে। জনগণ নিজের ইতিহাস নিজেরাই সৃষ্টি করে। কিন্তু জনগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়? অর্থাৎ, কিসের থেকে বিবাদমান ধ্যানধারণার সংঘর্ষের উদয় হয়? মানব সমাজের বিপুল অংশে এই সমস্ত সংঘাতের সামগ্রিক ফলটি কী? বস্তুগত জীবনের উৎপাদন, যা মানুষের সমস্ত ঐতিহাসিক কার্যকলাপের ভিত্তি গঠন করে, তার বাস্তব শর্তগুলি কী কী? এইসব শর্তের বিকাশের নিয়ম কী? এই সবগুলি বিষয়ের ওপর মার্কস মনোযোগ দেন এবং ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত চর্চার পথনির্দেশ করেন, যা তার বিপুল বৈচিত্র্য ও পরস্পরবিরোধিতা সত্ত্বেও একটি একক পদ্ধতি হিসাবে নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়।

শ্রেণিসংগ্রাম

এ কথা সকলেরই জানা যে, একটা নির্দিষ্ট সমাজের একদল সদস্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে লড়াই বাধে অন্য আরেক দল সদস্যের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের। সামাজিক জীবন সংঘর্ষে ভরা, ইতিহাসে দেখা যায় জাতিতে জাতিতে ও সমাজে সমাজে এবং জাতি ও সমাজগুলির নিজেদের ভিতরে সংগ্রাম। সেখানে পালা করে দেখা দেয় বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া, শান্তি ও যুদ্ধ, অচলাবস্থা ও দ্রুতবেগ প্রগতি অথবা অবক্ষয়ের পর্ব। এই আপাতদৃষ্ট গোলকধাঁধা ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলি আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ দিল পথনির্দেশ— শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব। কোনও একটি সমাজ বা কয়েকটি সমাজ-গোষ্ঠীর সকল সদস্যের সমগ্র প্রচেষ্টা অধ্যয়ন করলেই তবে এই প্রচেষ্টাগুলির ফলাফলের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। এখন, এই পরস্পর সংঘর্ষরত প্রচেষ্টাগুলি উদ্ভূত হয়, প্রতিটি সমাজ যে সব শ্রেণিতে বিভক্ত, সেগুলির অবস্থান ও জীবনযাত্রার ধরনের পার্থক্য থেকে। কমিউনিস্ট ইশতেহার-এ মার্কস লিখেছেন ঃ এখনও পর্যন্ত যতগুলি সমাজ এসেছে, তাদের সকলের ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। (এঙ্গেলস পরে যোগ করেছেন, আদিম গোষ্ঠীগুলির ইতিহাস এর মধ্যে পড়ে না।) স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ডকর্তা ও কারিগর, এক কথায় নিপীড়ক ও নিপীড়িত— সর্বদাই একে অপরের বিরোধী হিসাবে থেকেছে, কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে অবিরাম লড়াই চালিয়ে গেছে। প্রত্যেক বারই এ লড়াই শেষ হয়েছে, হয় গোটা সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে, অথবা সংঘর্ষরত শ্রেণিগুলির সব ক'টিরই ধ্বংসে। ... সামন্তী সমাজের ধ্বংসস্তূপ থেকে তৈরি হওয়া আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণিবিরোধের অবসান ঘটেনি। এই ব্যবস্থা শুধু পুরনোগুলির জায়গায় পত্তন করেছে নতুন নতুন শ্রেণি, নিপীড়নের নতুন পরিস্থিতি, সংগ্রামের নতুন ধরনগুলিকে। আমাদের যুগ, এই বুর্জোয়া যুগের কিন্তু একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি হল, এই যুগ শ্রেণি-বিরোধকে এখন অনেক সরল করে দিয়েছে। সমাজ সামগ্রিক ভাবে আরও বেশি করে দুটি বৃহৎ শত্রুশিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, সরাসরি একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা দুটি বৃহৎ শ্রেণি— পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রেণিতে।" মহান ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপীয় ইতিহাস অনেকগুলি দেশে অতি পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে যে, ঘটনাস্রোতের মূলে রয়েছে আসলে শ্রেণিগুলির ভিতরে সংগ্রাম। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্বে (১৭৯২ সালে ফরাসি বিপ্লবের ফলে সিংহাসনচ্যুত বুরবোঁ রাজবংশ ১৮১৪ সালে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। এখানে 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা' বলতে ১৮১৪-১৮৩০— এই সময়কালকে বোঝানো হয়েছে যখন ফ্রান্সের সিংহাসনে ছিল বুরবোঁ বংশ।) দেখা দিয়েছিলেন একাধিক ঐতিহাসিক (তিয়েরি, গিজো, মিনিয়ে, তিয়ের), যাঁরা তৎকালীন ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে স্বীকার না করে পারেননি যে, গোটা ফরাসি ইতিহাস বোঝার চাবিকাঠি হল শ্রেণিসংগ্রাম। আধুনিক যুগ হল পুঁজিপতি শ্রেণির সম্পূর্ণ বিজয়, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, ব্যাপক (সর্বজনীন যদি না-ও হয়) ভোটাধিকার, জনগণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত সস্তা দৈনিক সংবাদপত্র ইত্যাদির যুগ। এই সময়কাল হল শক্তিশালী ও সর্বদা বাড়তে থাকা শ্রমিক ও কর্মচারীদের সংগঠন ইত্যাদিরও যুগ। — এসব আরও বেশি লক্ষণীয় ভাবে (যদিও কখনও কখনও ভীষণ একপেশে, 'শান্তিপূর্ণ' এবং 'নিয়মতান্ত্রিক' চেহারায়) দেখিয়েছে যে, ঘটনাবলির মূল চালিকাশক্তি হল শ্রেণিসংগ্রাম। মার্কস রচিত 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর নিচে উদ্ধৃত অংশটি থেকে আমরা দেখতে পাবো, আধুনিক সমাজে প্রতিটি শ্রেণির অবস্থানের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণির বিকাশের শর্তাবলি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস সমাজবিজ্ঞানের কাছে কী দাবি করেছিলেন ঃ ''বর্তমানে যে সব শ্রেণি বুর্জোয়া শ্রেণির মোকাবিলা করছে, সেগুলির মধ্যে সর্বহারা শ্রেণিই

সাতের পাতায় দেখুন

বাঁকুড়ায় কিডনির রোগীরা ওষুধের দাবিতে আন্দোলনে

সচরাচর যেমনটা দেখা যায় না, গত ২৪ ডিসেম্বর কার্যত তেমন দৃশ্যই দেখা গেল বাঁকুড়া সিএমওএইচ এবং জেলাশাসকের দপ্তরে। কিডনি রোগে আক্রান্ত নিয়মিত ডায়ালিসিস করে বেঁচে থাকা রোগীরা যাদের মধ্যে কিছু সংকটজনক রোগীও আছেন, তাঁদেরই মিছিল করে এসে স্মারকলিপি দিতে হল জীবনদায়ী ওষুধের সুষ্ঠু সরবরাহের দাবিতে।

কিডনি রোগে আক্রান্ত ডায়ালিসিস রোগীদের শরীরে প্রোটিনের গুরুতর ঘাটতি মেটানোর জন্য এরিথ্রোপোয়েটিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি জীবনদায়ী ওষুধ। এই ওষুধের রোগীদের অবস্থা অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে এক দুই বা তিনটি পর্যন্ত ইঞ্জেকশন লাগতে পারে। এতদিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় এই ইনজেকশনের ভায়ালগুলি রোগীদের প্রত্যেক মাসে এককালীন দিয়ে দেওয়া হত। ফ্রিজে রেখে সময়মতো নিয়ে নিতেন রোগীরা। বাঁকুড়া জেলার ক্ষেত্রে দু'মাস হল সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে এবার থেকে প্রতিটি ডোজ রোগীকেই হাসপাতালে এসে নিয়ে যেতে হবে। আগের মতো এককালীন দেওয়া হবে না। এর ফলে রোগীদের প্রাণান্তকর হয়রানির মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সপ্তাহে দু'দিন অথবা তিনদিন বিভিন্ন হাসপাতালে ডায়ালিসিসের পরে ইঞ্জেকশনের জন্য ছুটতে হচ্ছে জেলা হাসপাতালে, গুরুতর অসুস্থ রোগীকেই লাইনে দাঁড়িয়ে তা নিতে হচ্ছে প্রাণের দায়ে। কোনও কোনও রোগীর বাড়ি ৬০-৭০ কিলোমিটার দূরে। সপ্তাহে দু'-তিন দিন জেলায় ছুটে আসা, তারপর লাইনে দাঁড়িয়ে ইঞ্জেকশন নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব ও অমানবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। নতুন এই নিয়মের ফলে অসংখ্য রোগীকে ওষুধ ছাড়াই থাকতে হচ্ছে। পরিণামে অত্যন্ত দ্রুত অবনতি হচ্ছে বহু রোগীর স্বাস্থ্যের।

বাঁকুড়া জেলায় ইতিমধ্যে কিডনি রোগীদের নানা সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা তথ্যের আদান-প্রদান, রক্তের জোগানের জন্য রক্তদান শিবির সংগঠিত করা ইত্যাদির লক্ষ্যে কিডনির রোগে গুরুতর অসুস্থ সুজিত রায়ের উদ্যোগে কিডনি কেয়ার অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছে। বাঁকুড়া জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের এই অমানবিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কিডনি কেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রোগীরা নিজেরাই রাস্তায় নামেন।

তাঁরা দাবি জানান, আগের মতো প্রতি মাসে প্রয়োজনীয় প্রোটিন ইনজেকশন একসাথেই দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ দাবি না মেনে নিলে এই রোগীদের বিশেষ করে যারা আর্থিকভাবে সঙ্গতিহীন তাদের মৃত্যু ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। কিডনি কেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায় জানিয়েছেন, জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর এই দাবি মেনে না নিলে তারা প্রয়োজনে আমরণ অনশনে বসবেন।

সিপিডিআরএস-এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

২৬ ডিসেম্বর মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর প্রথম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুরের গ্রান্ট হলে।

মানবদরদি শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কাফিল খানকে বরখাস্ত এবং সম্প্রতি নাগাল্যান্ডে আফস্পা আইনকে ঢাল করে ১৪ জন শ্রমিককে নির্বিচারে হত্যার বিরুদ্ধে দুটি নিন্দা প্রস্তাব পেশ করেন খন্দকার গোলাম মোর্তুজা। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক চন্দ্রপ্রকাশ সরকার। সাংগঠনিক রিপোর্ট এবং মূল প্রস্তাব পেশ করেন যথাক্রমে মেহেবুব আলম এবং আইয়ুব হোসেন। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন দেবাশীষ চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তফা, রামকৃষ্ণ সিংহ, লতিফ সরকার প্রমুখ। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ ও সহ-সম্পাদক রাজকুমার বসাক উপস্থিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকারকে সভাপতি, দেবাশীষ চক্রবর্তীকে কার্যকরী সভাপতি এবং মেহেবুব আলমকে সম্পাদক করে জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অদিতি কুমার ধাওয়া।

মধ্যপ্রদেশে ৪৪ লাখে নিলাম পঞ্চায়েত প্রধানের পদ

গোল হয়ে বসে কয়েক জন। দাঁড়িয়ে কিছু লোক। ভিড়ের মধ্যে থেকে দর হাঁকা শুরু হল ২০ লাখ...৩০ লাখ...! কেউ আবার বলে উঠল ৪৩ লাখ। দর চড়তে চড়তে শেষে ৪৪ লাখে রফা হল। না, এটা কোনও প্রাচীন বা মূল্যবান জিনিসের নিলাম হচ্ছিল না। পঞ্চায়েত প্রধান পদের দর উঠছিল। যে যত বেশি টাকা দেবেন, তিনিই হবেন পঞ্চায়েত প্রধান পদের অধিকারী। মধ্যপ্রদেশের ভাতাউলি গ্রামে পঞ্চায়েত প্রধানকে বাছতে গ্রামবাসীরাই ওই পদের নিলাম করলেন।

... অশোকনগর জেলার ভাতাউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদের জন্য চার জন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে টাকার অঙ্কে সকলকে হারিয়ে ৪৪ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সৌভাগ সিংহ যাদব এই পদ জিতে নিয়েছেন।

... প্রধান পদ জিততেই গ্রামবাসীরা সৌভাগকে মালা পরিয়ে নতুন প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে গ্রাম কমিটি থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সৌভাগের বিরুদ্ধে কেউ মনোনয়ন দাখিল করতে পারবেন না। ...

ভোপাল ১৬ ডিসেম্বর, আনন্দবাজার পত্রিকা

হস্টেল কর্মচারীদের বকেয়ার দাবিতে ডেপুটেশন

নদীয়া জেলার তপশিলি জাতি-উপজাতি আশ্রম হস্টেলে কর্মচারীরা এক বছর ধরে তাঁদের মজুরি পাচ্ছেন না। অবিলম্বে তা মেটানোর দাবিতে ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আধিকারিক দ্রুত সমস্ত পাওনা মেটানোর আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জেলা আশ্রম হস্টেল সাব কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্য মধুসূদন প্রামাণিক, ইউনিয়নের সভাপতি সুনির্মল দাস এবং জেলা সম্পাদক দেবাশীষ ব্যানার্জী।

বেকারদের চাকরি সহ নানা দাবিতে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে এআইডিওয়াইও-র ধরনা। ৩১ ডিসেম্বর

দক্ষিণ বারাশতে সংস্কৃতি মেলা

দক্ষিণ বারাশত স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইউথ কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য উচ্চতর বিদ্যালয়ে ২৫-৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় একবিংশ দক্ষিণ বারাশত সংস্কৃতি মেলা।

ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের সার্ধশতবর্ষে এবং সঙ্গীত সাধক অতুলপ্রসাদ সেন, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে আলোচনা সভা হয় এই মেলায়। অনুষ্ঠিত হয় চারদিন ব্যাপী জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির, সুগার পরীক্ষা ও ইসিজি নির্ণয়ের ব্যবস্থা হয়। ২৫ ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সংস্কৃতিব্যক্তিত্ব প্রাক্তন শিক্ষক বাসুদেব রায়মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগরের সম্পাদক তথা প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর।

৩০ ডিসেম্বর সম্বর্ধিত হয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, ফোরামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী সুবীর দাস। পুরস্কার বিতরণ ও বিভিন্ন স্থানীয় স্কুলের দশজন গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়। পরিবেশিত হয় গীতিআলেখ্য 'রাজা রামমোহন রায়।' অনুষ্ঠান পরিচালনায় সাহায্য করেন ফোরামের সভাপতি প্রদ্যোৎ হালদার, সহ সভাপতি ইস্রাফিল গাজী ও সম্পাদক বিক্রম বসু।

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া
সরল করার দাবিতে
হরিয়ানার ভিওয়ানিতে
শ্রম কল্যাণ দপ্তরে
এআইইউটিইউসি
অনুমোদিত নির্মাণ মজদুর
ইউনিয়নের বিক্ষোভ।
৩১ ডিসেম্বর

উৎসবে উৎসাহ দিয়ে এখন স্কুল-কলেজ বন্ধ সরকারের আচরণ দায়িত্বজ্ঞানহীন

এ আই ডি এস ও

করোনা সংক্রমণে পুনরায় স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক ৩ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

করোনা সংক্রমণের হঠাৎ হার বৃদ্ধিকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার নোটিশ দিয়ে পুনরায় স্কুল কলেজ বন্ধ রাখা সহ সাধারণ মানুষের জীবিকার সাথে যুক্ত অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ আরোপ করল, তা অনিবার্য ছিল না। বাস্তবে রাজ্যের চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ মহলের সাবধান বার্তায় কান না দিয়ে পানশালা, বার-রেস্তোরাঁ, শপিংমল প্রভৃতিকে ঢালাও ছাড় দিয়ে এরই মাঝে নির্বাচন, বড়দিন, বর্ষবরণ সহ নানা উৎসব ঘটা করে আয়োজিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ছিলেন এগুলির উদ্বোধক। এই ভোটকেন্দ্রিক সস্তা জনপ্রিয় নীতির ফলেই রাজ্যে পুনরায় করোনার বাড়বাড়ন্ত এবং আবারও স্কুল কলেজে সম্পূর্ণ লকডাউন। এবারও কত ছাত্রছাত্রী শিক্ষার আঙিনা থেকে সরে যাবে, গবেষণার কাজ ব্যাহত হবে, তার জন্য কোনও উদ্বেগ সরকারের নেই। জনগণের জীবন জীবিকার সমস্যা আরও গভীর হবে। এর দায় নিশ্চিত ভাবেই সরকার নেবে না। আমরা সরকারের এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণকে নিন্দা জানাই। ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে সবাইকে অতি দ্রুত টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জনজীবনকে স্বাভাবিক করার যাবতীয় ব্যবস্থার দাবি জানাই।

ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে

এআইকেকেএমএস-এর সম্মেলন

মথুরাপুর ঃ ২৯ ডিসেম্বর এআইকেকেএমএস-এর মথুরাপুর-২ ব্লক সম্মেলন কঙ্কনদিঘীতে অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। দিল্লির সফল কৃষক আন্দোলনের বিজয় বার্তা প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া এবং এআইকেকেএমএস-এর সদস্য সংগ্রহ অভিযানের ডাক দেওয়া হয় সম্মেলনে। জয়দেব মাজীকে সভাপতি এবং গৌরাঙ্গ ঢালীকে সম্পাদক করে ২১ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য গোপাল বিশ্বাস, গুণসিন্ধু হালদার এবং সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক রেণুপদ হালদার ও সভাপতি মনোরঞ্জন পণ্ডিত বক্তব্য রাখেন।

হলদিবাড়ি ঃ ৩০ ডিসেম্বর কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি ব্লকের চৈতুর মোড়ে অল ইন্ডিয়া কিসান- খেত মজদুর সংগঠনের তৃতীয় হলদিবাড়ি ব্লক সম্মেলন হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রুহল আমিন। আনারুল হককে সভাপতি ও সাত্তার সরকারকে সম্পাদক করে ২০ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া ক্ষিতীশ মণ্ডলকে হলদিবাড়ি জোনালের সম্পাদক এবং গোপাল বর্মনকে দেওয়ানগঞ্জ জোনালের সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। সাত্তার সরকার বলেন, সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে ও ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে এই কমিটি গোটা ব্লকে লড়াই গড়ে তুলবে।

কনট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক কর্মীদের সভা

২৬ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া শহরে কনট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক কর্মীদের এক সভা হয়। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সিবিইইউএফ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নারায়ণ পোদ্দার, তপন বিশ্বাস, তপন মির। সভায় হাবড়া আঞ্চলিক অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হয়।

এআইডিএসও-র প্রতিষ্ঠা দিবসে

ছাত্র আন্দোলন জোরদার করার ডাক

দেশ স্বাধীন হলেও দেশের গরিব শ্রমজীবী মানুষের আকাঙ্খিত সর্বাঙ্গীন মুক্তি আসেনি, বরং দেশের সরকার শিক্ষা সহ নানা ক্ষেত্রে একের পর এক কালা আইন প্রয়োগ করে চলছে। ২৮ ডিসেম্বর এআইডিএসও-র ৬৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এ কথা বলেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এ দিন কলকাতায় এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ পতাকা উত্তোলন করেন। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার, রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

ডাঃ আর আহমেদ মেডিকেল কলেজ, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ছাত্র সভা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের ফি সম্পূর্ণ মকুব, গণপরিবহণে ছাত্রছাত্রীদের এক-তৃতীয়াংশ কনসেশন, মোবাইল রিচার্জ মাশুল কমানো এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবিতে এআইডিএসও কর্মীরা প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সোচ্চার হন। বিকেলে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ বলেন, আমরা দায়িত্বশীল ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে দেশের শিক্ষা ও ছাত্র সমাজের স্বার্থে সর্বজনীন, বিজ্ঞানমনস্ক, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার দাবিতে বারবার লড়াই আন্দোলন গড়ে তুলেছি। বর্তমানে শিক্ষার মর্মবস্তু ধ্বংসকারী ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অবৈজ্ঞানিক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ প্রয়োগের মাধ্যমে 'টাকা যার শিক্ষা তার' নীতি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এরই বিরুদ্ধে দেশের ছাত্র সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের জয় থেকে যথাযথ শিক্ষা নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে দুর্বার ছাত্র আন্দোলনে সামিল হোন।

বাঁকুড়ায় মিড-ডে মিল কর্মীদের

ডেপুটেশন জেলাশাসককে

বাঁকুড়া জেলার মিড-ডে মিল কর্মীরা তাদের সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, অবসরের পর পেনশন, পি এফ চালু, মাসিক ২১ হাজার টাকা বেতন, অবিলম্বে বকেয়া বেতন প্রদান ও অন্যান্য দাবিতে ২৯ ডিসেম্বর জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে দুই শতাধিক কর্মী সুসজ্জিত মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরে যায়। ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সনাতন দাস ও জেলার অন্যান্য নেতারা বক্তব্য রাখেন। সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র দেন। তিনি স্থানীয় দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সুজিত রায় মিড-ডে মিল কর্মীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আরও তীব্র আন্দোলনের আহ্বান জানান। অন্যতম সংগঠক স্বপন গরাই বলেন, যে দু'মাস স্কুল বন্ধ থাকে সেই মাসগুলিতেও বেতন দিতে হবে।

কোচবিহারে সম্মেলন ঃ ২৬ ডিসেম্বর কোচবিহার ১নং ব্লকে সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সাহেবের হাট হাইস্কুলে। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পণ্ডা এবং জেলা সংগঠক রীনা ঘোষ ও সদর মহকুমা কমিটির সভানেত্রী মঞ্জু সাহা। দুই শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। শঙ্করী রায়কে সভানেত্রী, পারুল বর্মনকে সম্পাদিকা করে ২১ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

ফালাকাটায় পরিচারিকা সম্মেলন

২৬ ডিসেম্বর সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লক কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ফালাকাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ১২৫ জন পরিচারিকা সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে ঝর্ণা সরকার, মিনতি বর্মন, রীতা ঠাকুর, কৌশল্যা বর্মন, ইলা দে সরকার, মায়া বর্মন, শিল্পী শীলা দাস প্রমুখ পরিচারিকা তাদের পেশাগত সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। কর্মক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং পাচার-ধর্ষণ হত্যায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে বক্তব্য রাখেন কোচবিহার জেলা সম্পাদিকা ফিরোজা আহমেদ ও রাজ্য সম্পাদিকা পার্বতী পাল। উপস্থিত ছিলেন সমিতির কলকাতা জেলা সম্পাদিকা তনুশ্রী শাসমল। সাপ্তাহিক সবেতন ছুটির দাবি ওঠে সম্মেলনে।

কৌশল্যা বর্মনকে সভাপতি, কোকিলা বর্মনকে সম্পাদিকা, রীনা তরফদারকে সহ সম্পাদিকা ও ইলা দে সরকারকে কোষাধ্যক্ষ করে মোট ২৫ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

পাঠকের মতামত

বিনোদন ভাতা ১৪ হাজার বাড়ল

রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আমলাদের বিনোদন ভাতার নামে এক ধাক্কায় কুড়ি থেকে চৌত্রিশ হাজার টাকা মাসিক ভাতা বরাদ্দ করা হল। বর্তমানে যেখানে লক্ষ লক্ষ উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতী বেকার, পেটের দায়ে অসংখ্য পিএইচডি ডিগ্রি হোল্ডারও ডোমের চাকরির জন্য লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছেন, হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতী যেখানে নামমাত্র টাকায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অত্যন্ত অসম্মানজনক কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, তখন এই বৃদ্ধি অযৌক্তিক, অমানবিক। করোনায় অর্থনৈতিক মন্দার দোহাই দিয়ে যখন সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে কোটি কোটি কর্মরত মানুষকে কর্মচ্যুত করা হয়েছে, ঠিক সেই সময় তিনলাখি-চারলাখি আমলাদের মাস মাইনে কার্যত এক ধাক্কায় এতটা বাড়িয়ে দেওয়া হল, যা বহু কর্মচারীর সামগ্রিক মাস-মাইনের থেকেও বেশি।

কিছুদিন আগেই আমলা ও পুলিশদের বিশেষ ভাতা হিসেবে পাঁচ থেকে দশ হাজার পর্যন্ত মাসিক ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যার সুযোগ একেবারে তৃণমূল স্তরের বিডিও-রা এবং সমস্ত স্তরের পুলিশকর্মীরাও আজ পাচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতে এই বিনোদন ভাতাও উক্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো আজ শুধু সময়ের অপেক্ষা। একদিকে সরকার বলছে টাকানেই, তাই তারা চাকরি দিতে পারছে না। অথবা খুবই অল্প মাইনেতে ভলেন্টিয়ার হিসেবে শিক্ষক, অধ্যাপক থেকে পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মী সবই নিয়োগ করা হচ্ছে। অথচ এভাবে বিপুল ভাতাবৃদ্ধি করছে আমলাদের।

টাকা না থাকার অজুহাত দেখালেও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার এমপি-এমএলএদের ভাতা বারবার বাড়াতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ রাজ্যজুড়ে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে সরকারি কর্মীদের ন্যায্য বকেয়া ডি এ না দিয়ে এবং বিভিন্ন ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করে রেখে, দফায় দফায় আমলা ও পুলিশের বেতন ও বিশেষ বিশেষ ভাতা বাড়িয়ে চলেছে।

যেখানে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীরা গত দু'বছর ধরে দিন রাত এক করে করোনার অতিমারি সামলেছেন, অনেকেই দীর্ঘদিন পরিবার থেকে আলাদা থাকতে বাধ্য হয়েছেন, পরিবারকে দেখতে না পারার ফলে তাদেরই পরিবারের সদস্যরা অনেকে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। অনেকে ভাড়া বাড়ি থেকে উচ্ছেদ পর্যন্ত হয়েছেন। গত দু'বছরে তাদের ভাতা কিন্তু এক পয়সাও বাড়ানো হল না। উপরন্তু ন্যায্য পাওনা থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। ডাক্তারদের রুরাল অ্যালাউন্স/বিশেষজ্ঞ ভাতা/প্রশাসনিক ভাতা আজও মাসে দু'শো টাকা। একি অধিকার না দয়ার দান! আশাকর্মীরা দিন রাত এক করে করোনা প্রতিরোধে কাজ করলেও তাদের ভাতা তো বাড়ানোই হয়নি, উল্টে তাদের ন্যায্য ভাতাও গত ন'মাস দেওয়া হয়নি। সরকারের এই বৈষম্য সৃষ্টিকারী ভূমিকা আজ বড় উৎকট।

আসলে একটি স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের রাজ্য চালাতে দরকার স্বৈরতান্ত্রিক আমলা ও পুলিশের দল। আর লাগে দুয়ারে সরকার, লক্ষীর ভাণ্ডার, মেলা-খেলার মতো চটকদার রাজনীতি। কোথায় সাধারণ মানুষ মরল, কোথায় উচ্চশিক্ষিত বেকাররা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ালো, মানুষ বিনা চিকিৎসায়, বিনা অন্নে মারা গেল— তার যায়-আসে না।

ডাঃ সজল বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক
সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম

আধার সংকট

রেশনে আধার সংযোগ বাধ্যতামূলক হওয়ায় নানা সংকট দেখা দিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে আঙুলের ছাপ বায়োমেট্রিকের সঙ্গে মিলছে না। কঠোর পরিশ্রমের কারণে বিশেষত মহিলাদের অভ্যাস বসত হাত দিয়ে গরম কড়া ধরার কারণে তাঁদের আঙুলের রেখার পরিবর্তন ঘটে। এ ছাড়া, বয়স্ক মানুষ এবং মুমূর্ষু রোগীরা অনেক সময়েই রেশন দোকানে বা বায়োমেট্রিক সেন্টারে যেতে পারছেন না। যদিও বা কষ্ট করে এই সমস্ত বয়স্ক মানুষদের বায়োমেট্রিক ছাপ দেওয়ার জন্য হাজির করানো যাচ্ছে, বার্ধক্যজনিত কারণে এঁদের পেশি শিথিল হয়ে যাওয়ায় এঁদের বায়োমোট্রিক আধার তৈরির সময় প্রদত্ত বায়োমেট্রিকের সঙ্গে মিলছে না।

এ ছাড়া রিচার্জের টাকার অঙ্ক বৃদ্ধির কারণে বা বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু মানুষের আধার তৈরির সময় প্রদত্ত মোবাইল নম্বরের পরিবর্তন ঘটেছে।

সে কারণে বহু মানুষের মোবাইলে রেশন সামগ্রী সংগ্রহের সময় ওটিপি আসছে না। এফপিএস ডিলাররা এই সমস্ত মানুষদের বিনামূল্যের মাসিক রেশন দিতে অস্বীকার করছেন। এই ব্যাপারে গ্রাহক রেশন অফিসে গিয়েও কোনও সুরাহা পাচ্ছেন না।

সমস্যা সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

অভিজিৎ মান্না
বালি, হাওড়া

বিজ্ঞাপনেই নজর, বেটি বাঁচানোতে নেই সরকার

২৯ ডিসেম্বর আরও একটি নির্ভয়া দিবস পার হয়ে গেল। কতটা অভয় মহিলাদের দিতে পারল রাষ্ট্র? মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতাই প্রকাশ পাচ্ছে সরকারের। ২০১২ সালে ১৬ ডিসেম্বর দিল্লির প্যারামেডিকেল ছাত্রী নির্ভয়ার উপর নরপিশাচদের অত্যাচারে শিউরে উঠেছিল সারা দেশের মানুষ। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল। দিল্লির হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার মধ্যেও জনসাধারণের ঐতিহাসিক আন্দোলনের সাক্ষী ছিল গোটা দেশ। নির্ভয়াকে বাঁচানো যায়নি। ২৯ ডিসেম্বর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। দেশজোড়া বিক্ষোভের মুখে কংগ্রেস সরকার 'নির্ভয়া তহবিল' ঘোষণা করে, যা মহিলাদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নে ব্যয় করা হবে বলে ব্যাপক প্রচারও হয়েছিল। কিন্তু প্রচারই সার, কাজ কিছুই হয়নি। পরবর্তীকালে বিজেপি সরকার কি করেছে? মহিলাদের প্রতি সহৃদয়তার নমুনা হল— ২০১৩-২০২০ পর্যন্ত ওই তহবিলের ৬৪ শতাংশ টাকা খরচই করা হয়নি। খরচ করা অংশও অন্য কাজে (বাড়ি তৈরিতে) ব্যবহার করা হয়েছে। যে কাজগুলির প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলায়, তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কিছুই প্রায় হয়নি। অথচ মহিলাদের উপর নির্যাতনের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ২০১৫ সালেই বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের ঘোষণা করেছিল। বেটিরা কতটা শিক্ষার মুখ দেখেছে, চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে কিংবা তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন— সে সমস্ত দেখার আগে সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যগুলি ৬ বছরে এই প্রকল্পের মাত্র ২৫ শতাংশ খরচ করেছে। ৭৯ শতাংশ অর্থাৎ ৪৪৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে শুধু বিজ্ঞাপনেই। বিজেপি সাংসদ গাভিট সম্প্রতি এই তথ্য সংসদে পেশ করেছেন। তাহলে নিরাপত্তায় কত খরচ হয়েছে, দেশের মহিলা ও শিশুরাই বা কতটা নিরাপদে রয়েছেন?

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-তে শিশুদের উপর ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৩১টি অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, এই সংখ্যাটা নথিভুক্ত হওয়া ঘটনা। নথিভুক্ত হয়নি এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। আর মহিলাদের নিরাপত্তা? এনসিআরবি-র তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-তে প্রায় চার লাখ মহিলার উপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন (এনসিডব্লিউ) -র তথ্যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে, ২০২০-র তুলনায় ২০২১-এ মহিলাদের উপর অত্যাচার বেড়েছে ৩০ শতাংশ। (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-১ জানুয়ারি, ২০২২)

শিশুকন্যা এবং মহিলাদের উপর নির্যাতন কি শুধু আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা, নাকি সামাজিক সমস্যা? ঘটনা নথিভুক্ত হওয়া না হওয়া আইন-শৃঙ্খলার বিষয়, প্রভাবশালীরা এ ধরনের দুষ্কর্মে যুক্ত থাকলে বহু সময়েই থানা অভিযোগ নিতে চায় না। এ কথা ঠিক, পুলিশ-প্রশাসন তৎপর হলে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়াও সম্ভব। কিন্তু এ রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটার মূল কারণ বর্তমানের পুঁজিবাদী সমাজের পচা-গলা অবক্ষয়ী সংস্কৃতি, তার দোসর মদের ঢালাও প্রসার। তার পাল্টা উন্নত সংস্কৃতির চর্চা সমাজের মধ্যে না হলে এ ধরনের ঘটনা আটকানো যাবে না। ওই অবক্ষয়ী সংস্কৃতি চার হাত-পায়ের মানুষকে নরপশুতে পরিণত করে, প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার পথে হিমালয়-সমান বাধা সৃষ্টি করে। যুবকেরা অবক্ষয়ী সংস্কৃতি বহন করে চললে এই সমাজের 'রক্ষক' শাসক দলগুলির সুবিধা। দুর্নীতিতে ডুবে থাকা, নিম্ন রুচি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ নিয়ে চলা এই দলগুলি ওই নরপশুদের তাঁবে রাখে, এদের সাহায্যে নানা রকম অপকর্ম করে। তাই তারা এই শক্তির বাড়বাড়ন্ত চায়। তাদের প্রশ্রয়েই এই রক্তবীজের ঝাড় বেড়ে ওঠে। ঘটে চলে একটার পর একটা পৈশাচিক ঘটনা— ধর্ষণ, খুন, যৌন-অত্যাচার। একটা নৃশংস ঘটনা আর একটাকে ছাড়িয়ে যায়।

বেটি বাঁচাও-এর প্রচার চলবে, পাশাপাশি মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, খুনের ঘটনাও কি চলতেই থাকবে? যারা আত্মসর্বস্বতা আঁকড়ে জীবন নির্বাহ করেন না, যারা সমাজ-বিমুখ মানসিকতা নিয়ে চলেন না, তাঁরা এ ধরনের নৃশংস ঘটনায় অন্তরিকভাবে কষ্ট পান, হৃদয়ে তাঁদের রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন না, কীভাবে এই সমস্যাকে নির্মূল করা সম্ভব। সরকারে আসীন দল কিংবা ক্ষমতালোভী দলগুলির জনদরদি মুখোশ খুলে দিয়ে এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার দিন এসেছে আজ। প্রশ্ন তোলার সময় এসেছে, বিজ্ঞাপনই যে বিজেপি-কংগ্রেসের একমাত্র ঢাল, তারা সত্যিই বেটিদের নিরাপত্তার জন্য কতটা ভাবে? আসলে সরকারের 'বেটি বাঁচাও' প্রকল্পের ফানুস ফুটো হয়ে গেছে।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন পরীক্ষা

দুয়ের পাতার পর

রচিত হয়েছে আরএসএস ও সংঘ পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশে, পরিকল্পনায় ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। দেশের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক সহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কোনও অংশের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন তারা বোধ করেননি। এমনকী 'শিক্ষা যুগ্ম তালিকাভুক্ত' হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যগুলির কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। গত ২৯ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই নীতি ঘোষণা হয়েছে, সংসদে পেশ না করেই। দেশজুড়ে প্রথম সারির শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী সমেত সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পথে ফ্যাসিস্ট কায়দায় তারা এই নীতি কার্যকর করতে চাইছেন। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে গোটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংঘ-পরিবারের সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে ময়দানে নামানো হয়েছে। এটা করতে গিয়ে বিধিবদ্ধ স্বশাসিত সংস্থাগুলির স্বশাসনে নগ্নভাবে তারা হস্তক্ষেপ করছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধিকারের ধারণা হল গণতন্ত্রের ধারণা, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় সর্বজনস্বীকৃত গণতান্ত্রিক রীতি। তাকে তারা পদদলিত করে এমনকী ইউজিসি-র মতো ঐতিহ্যসম্পন্ন বিধিবদ্ধ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে সরকার ও শাসকদলের দাসে পরিণত করে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ চালু করতে চলেছে। একে প্রতিরোধ করতে না পারলে শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে আসবে আরও ঘোরতর দুর্দিন। আশার কথা, শিক্ষক-অধ্যাপকরা এর বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন। প্রতিবাদে নেমেছে সেভ এডুকেশন কমিটিও।

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর মতবাদ

তিনের পাতার পর

হল একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণি। আধুনিক শিল্প-কলকারখানার সামনে পড়ে অন্য শ্রেণিগুলির ক্ষয় হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। সর্বহারা শ্রেণি হল আধুনিক শিল্প-কলকারখানার বিশেষ এবং অপরিহার্য সৃষ্টি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশ হিসাবে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ক্ষুদ্র উৎপাদক, দোকানদার, মিস্ত্রি, চাষি— এরা সবাই নিজেদের অস্তিত্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাই তারা বিপ্লবী নয়, তারা রক্ষণশীল। শুধু তাই নয়, তারা প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ ইতিহাসের চাকা তারা পিছন দিকে ঘোরাতে চায়। দৈবাৎ যদি তারা বিপ্লবী হয়, সেটাও তারা হয় নিজেদের আসন্ন সর্বহারা শ্রেণিভুক্তির কথা বিবেচনা করে। এই ভাবে তারা বর্তমান নয়, নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বার্থ রক্ষা করে। সর্বহারা শ্রেণির দৃষ্টিকোণে নিজেদের স্থাপন করতে তারা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করে।” একাধিক ঐতিহাসিক রচনায় মার্কস বস্তুবাদী ইতিহাসবিদ্যার চমৎকার ও সুগভীর নিদর্শন রেখে গেছেন, আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণির এবং কখনও কখনও শ্রেণির ভেতর বিভিন্ন গোষ্ঠী বা স্তরের অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন, এবং স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন কেন এবং কী ভাবে প্রতিটি শ্রেণিসংগ্রামই হল একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। ঐতিহাসিক বিকাশের পরিণতি নির্ধারণ করতে গিয়ে মার্কস, সামাজিক সম্পর্ক এবং এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে, অতীত থেকে ভবিষ্যতে উত্তরণের অন্তর্বর্তী স্তরগুলির কী জটিল জাল বিশ্লেষণ করেছেন, উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি তার একটি উদাহরণ।

মার্কসের তত্ত্বের সবচেয়ে সুগভীর, পূর্ণাঙ্গ এবং বিশদ প্রমাণ তথা প্রয়োগ হল তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ।

মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ

‘পুঁজি’ বইয়ের ভূমিকায় মার্কস লিখেছেন: ‘আধুনিক সমাজের’, অর্থাৎ পুঁজিবাদী, বুর্জোয়া সমাজের, ‘বিকাশের অর্থনৈতিক নিয়মটিকে প্রকাশ করে দেওয়াই আমার এ রচনার আসল লক্ষ্য।’ ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট একটি বিশেষ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্কগুলির উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশের প্রক্রিয়ার অনুসন্ধানই মার্কসের

অর্থনৈতিক মতবাদের বিষয়বস্তু। পুঁজিবাদী সমাজে পণ্যই উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু। মার্কসের বিশ্লেষণও তাই শুরু হয়েছে পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়ে।

মূল্য

পণ্য হল, প্রথমত, এমন একটি জিনিস যা দিয়ে মানুষের কোনও একটি চাহিদা মেটে। দ্বিতীয়ত, এ হল এমন একটা জিনিস যার সঙ্গে অন্য কোনও জিনিসের বিনিময় চলে। বস্তুর উপযোগিতা থেকে তার ব্যবহার-মূল্য তৈরি হয়। বিনিময় মূল্য (কিংবা সহজ ভাষায় মূল্য) সর্বাগ্রে হল একটি সম্পর্ক, নির্দিষ্ট পরিমাণের এক ধরনের ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য ধরনের ব্যবহার-মূল্যের বিনিময়ের অনুপাত। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এই ধরনের কোটি কোটি বিনিময় প্রতিনিয়ত সমান সংখ্যক ব্যবহার মূল্যের মধ্যে, এমনকি একেবারে যাদের মিল নেই, একেবারে ভিন্ন জাতীয় ব্যবহার-মূল্যগুলি পরস্পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করে যাচ্ছে। এখন, এই ধরনের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে, সামাজিক সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভেতর যেসব বস্তু প্রতিনিয়ত পরস্পর সমতা রক্ষা করে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে সাধারণ মিলটা কী? এদের মধ্যে সাধারণ মিল হল, এসবই শ্রমের ফসল। বস্তুর বিনিময় করতে গিয়ে মানুষ বহু ধরনের শ্রমের মধ্যে সমতা বিধান করে। পণ্য-উৎপাদন হল সামাজিক সম্পর্কের এমন একটা ব্যবস্থা যাতে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তৈরি করছে (সামাজিক শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়ে), এবং বিনিময়ের সময় সেই সব বস্তুর পারস্পরিক সমতা রক্ষা করে যাচ্ছে। সুতরাং, সমস্ত পণ্যের মধ্যেই যে সাধারণ জিনিসটা রয়েছে সেটা উৎপাদনের কোনও শাখা বিশেষের প্রত্যক্ষ শ্রম নয়, নির্দিষ্ট একধরনের শ্রমও নয়, সেটা হল বিমূর্ত মনুষ্যশ্রম, সাধারণভাবে মনুষ্যশ্রম। কোনও নির্দিষ্ট সমাজের সমস্ত শ্রমশক্তি— যা সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যে নিহিত থাকে, তা হল সেই একই মনুষ্য শ্রমশক্তি— কোটি কোটি বিনিময়ের ঘটনায় তার প্রমাণ মিলবে। সুতরাং, একটা নির্দিষ্ট পণ্যের দ্বারা সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমসময়ের একটা নির্দিষ্ট অংশকেই বোঝায় মাত্র। মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ দিয়ে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পণ্যটির নির্দিষ্ট ব্যবহার-মূল্যটি উৎপাদনে যেটুকু শ্রমসময় সামাজিকভাবে আবশ্যক, সেই শ্রমসময় দিয়ে। “বিনিময় মারফত আমরা যখনই আমাদের ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে মূল্যের সমানীকরণ করি, তখনই আমরা মনুষ্যশ্রম, যা সেগুলির মধ্যে নিহিত থাকে, তারও সমানীকরণ করি। এ সম্পর্কে আমরা সচেতন নই বটে, কিন্তু করি এইটেই” (পুঁজি, ১ম খণ্ড)। অতীতের একজন অর্থনীতিবিদের কথা অনুসারে, মূল্য হল দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা সম্পর্ক। ভাল হত যদি তিনি এর সাথে শুধু যোগ করতেন, সামগ্রীর মোড়কে ঢাকা সম্পর্ক। মূল্য কী, তা বোঝা যায় শুধু একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ধরনের সমাজে উৎপাদনকে সামাজিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। যেখানে এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলি আবার আত্মপ্রকাশ করছে কোটি কোটি বার পুনরাবর্তিত ব্যাপক বিনিময় ঘটনার মধ্যে। “মূল্য হিসেবে দেখলে সমস্ত পণ্যই হল কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণের একটা ‘ঘনীভূত শ্রমসময়’” (কার্ল মার্কস, এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি)। পণ্যে রূপায়িত শ্রমের দুই ধরনের চরিত্রের সবিস্তার বিশ্লেষণের পর মার্কস মূল্য ও মুদ্রার রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এ গবেষণায় তাঁর প্রধান কাজ মূল্য থেকে টাকাপয়সার উদ্ভব পর্যালোচনা, বিনিময় ব্যবস্থার বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা, বিনিময়ের ব্যক্তিগত এবং ঘটনাক্রমিক শুরুর প্রক্রিয়া, (‘মূল্যের প্রাথমিক, ঘটনাক্রমিক রূপ,’ যেখানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনও পণ্যের বিনিময় হচ্ছে আর একটি পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে) যা পৌঁছচ্ছে মূল্যের সর্বজনীন রূপে, যখন নির্দিষ্ট সংখ্যক নানা জাতীয় পণ্যকে বিনিময় করা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পণ্যের সঙ্গে এবং যা মূল্যের মুদ্রারূপে গিয়ে শেষ হচ্ছে— সোনা হল সেই নির্দিষ্ট পণ্য, যা সর্বজনীন তুল্যমূল্য। বিনিময় ও পণ্য-উৎপাদনের বিকাশে উচ্চতম পরিণতি হিসেবে মুদ্রা সমস্ত ব্যক্তিগত শ্রমের সামাজিক চরিত্র ও বাজারের মারফত সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকের সামাজিক সম্পর্ককে ঢেকে দেয় এবং আড়াল করে। মুদ্রা কী কী ভূমিকা পালন করে, সে বিষয়ে সবিস্তারে মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বিশেষ জরুরি যে, এখানেও (‘পুঁজি’ গ্রন্থের প্রথমদিককার পরিচ্ছেদগুলির মতো) বিমূর্ত এবং আপাতদৃষ্টিতে মাঝে মাঝে নিছক অবরোহমূলক (ডিডাকটিভ) উপস্থাপন আসলে বিনিময় ও পণ্য-উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকাশের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ তথ্যের উপর নির্ভর করেই রচিত। যদি আমরা মুদ্রার বিষয়টি বিচার করি, তবে এটির অস্তিত্ব পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট স্তরকেই নির্দেশ করে। মুদ্রা নির্দিষ্ট করে যে যে ভূমিকাগুলি পালন করে, যেমন, শুধুমাত্র পণ্যের সমমূল্য হিসাবে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, সঞ্চয় অথবা বিশ্বজনীন মুদ্রা হিসাবে— এর কোনটার কখন প্রাধান্য ঘটছে, তা সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্তরকেই নির্দেশ করে (‘পুঁজি’, খণ্ড ১)।

(চলবে)

কোভিড নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের ব্যর্থতা

একের পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী নিয়ন্ত্রণের বদলে উৎসাহ দিতে বলে দিলেন, মানুষ যাতে আনন্দ পায় তার উপর তিনি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবেন না। এ জন্যই হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলাও বন্ধ করতে তিনি নারাজ। কারণ এসব করতে গেলে ভোটব্যাঙ্কে তার প্রভাব পড়তে পারে। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন এবং তারপর পুজোকে ঘিরে হুল্লোড়ের জেরে কীভাবে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউকে ডেকে আনা হয়েছিল, কত মানুষের জীবন গেছে, শারীরিক, আর্থিক দিক থেকে কত মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে গেছেন তা কি সরকার ভুলে গিয়েছিল! একদল মানুষ লাগামছাড়া হুল্লোড়কে আনন্দ মনে করলেই সরকারকে তাতে মদত দিতে হবে? এটাই কি সরকারের দায়িত্ব? জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানের চেয়ে উৎসবের জাঁকজমককে কোনও দায়িত্বশীল সরকার বড় করে দেখাতে পারে? অথচ সেটাই ঘটল। সরকারের এই চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার মূল্য দিতে হচ্ছে আজ সাধারণ মানুষকেই।

কোভিড সংক্রমণ মাত্রাছাড়া হওয়ার পর নতুন করে রাজ্যে নিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপের ঘোষণা করেছে সরকার। স্কুল-কলেজ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন করে বন্ধ হয়েছে। লোকাল ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, সরকারি-বেসরকারি অফিসে কর্মীসংখ্যা কমানো ইত্যাদি পদক্ষেপের ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী, পরিচারিকা ইত্যাদি স্তরের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে নতুন করে সমস্যা দেখা দেবে। শিক্ষাক্ষেত্র ইতিমধ্যেই অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন। এই পরিস্থিতিতে তা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীরাও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে পড়েছে। অথচ সরকার সময় মতো তার সঠিক ভূমিকা পালন করলে মানুষকে এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতো না।

এই প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারা বিশেষত প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ নানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ভূমিকাও কিছু আলাদা নয়। তাঁরা এখন উত্তরপ্রদেশের ভোটে মেতেছেন। কোভিড বিধি নস্যাৎ করে হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে জনসভা করে চলেছেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের আগে তাঁরাই ভোটের স্বার্থে কুম্ভমেলার সমারোহ করে সংক্রমণ ছড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সুযোগে উত্তরপ্রদেশ সহ মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাটেও লাফিয়ে লাফিয়ে কোভিড বাড়তে শুরু করেছে। তথাকথিত জনমোহিনী পদক্ষেপ নিয়ে ভোটব্যাঙ্ককে তুষ্ট করতে গিয়ে এভাবে মানুষকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও শাসকই কিছু কম যায় না। বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস যে যেখানে ক্ষমতায়, সেখানে যেমন এ কাজ করছে, বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিএমও সে পথেই হেঁটেছে। মানুষের মনে আছে, গত আগস্ট মাসে ঠিক একই কায়দায় কেরালায় ওনাম উৎসব নিয়ে মাতামাতিতে কোনও নিয়ন্ত্রণ না করে সে রাজ্যের সিপিএম সরকার কোভিড বৃদ্ধির বিপদ ডেকে এনেছিল।

টিকাকরণের প্রশ্নে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে ২১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শতকোটি টিকাকরণের ড্রাম বাজিয়েছেন। প্রচারের ডামাডোলে যে সত্যটি চাপা পড়ল, তা হল প্রাপ্তবয়স্কদের সাড়ে ৭৫ কোটি মানুষ পেয়েছেন মাত্র একটি ডোজ, ১১ কোটি জন একটি ডোজও পাননি। ১৫ থেকে ১৮ বছরের জন্য এবং ষাটোর্ধ্বদের বুস্টার ডোজের সরবরাহ কী ভাবে হবে তার কোনও রূপরেখা কেন্দ্রীয় সরকার করেনি। জনসাধারণের প্রতি সরকারগুলির ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকলে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করতে পারত?

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শপথ

দামিনীর মৃত্যু দিবস ২৯ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটি কলেজ স্কোয়ার থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত এক দৃপ্ত মিছিল করে। ওই দিন সংগঠনের নদীয়া জেলা কমিটি বারুইপাড়া এবং কৃষ্ণনগর শহরে পথসভা, শোকবেদিতে মাল্যদান ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান করে। এর মধ্য দিয়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ তীব্র আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করা হয়।

কলকাতা

কৃষ্ণনগর, নদীয়া

নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির সভা

২৯ ডিসেম্বর দামিনীর মৃত্যুদিনে নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ স্ট্রিটে মহাবোধি সোসাইটি হলে আলোচনাসভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আগে কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেওয়া হয়। 'স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর ও নারীসমাজ' শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাসন্তী দেবী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী বর্ধন রায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শান্তা দত্ত। গান আবৃত্তি শ্রুতিনাটকের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও সমানাধিকারের পক্ষে সোচ্চার হন বিভিন্ন শিল্পী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক তরুণ দাস এবং মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা প্রেম শর্মা এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ডাঃ অশোক সামন্ত এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ তরুণকান্তি নস্কর।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভ নদীয়ায়

সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার চালু করা এবং সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে ২১ ডিসেম্বর নদীয়া জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভ

আত্মঘাতী কৃষক পরিবারগুলিকে সাহায্য, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের বিদ্যুৎ বিল মকুব প্রভৃতি দাবিতে ২০ ডিসেম্বর পূর্ব বর্ধমান ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ

মালদায় নারী নির্যাতন ঃ শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

৩০ ডিসেম্বর মালদার নারায়ণপুরে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী নির্যাতনের শিকার হন। মেডিকেল রিপোর্টে অত্যাচারের প্রমাণ মেলে। ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। নির্যাতিতা ও তার পরিবারকে ওই দুষ্কৃতী হুমকি দিলে এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে মহিলা থানায় ডেপুটেশন দিয়ে দাবি জানানো হয়, কোনওভাবেই ধর্ষককে আড়াল করা চলবে না, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। পরে নেতাজি মোড়ে প্রতিবাদ সভা হয়। ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা এতে যোগ দেন।

বিধাননগরে মনোনয়ন এসইউসিআই(সি)-র

বিধাননগর পৌর নির্বাচন উপলক্ষে ২৪ ও ৩০ নং ওয়ার্ডের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন মিছিল করে

মোবাইল মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতায় ট্রাই দপ্তরে ছাত্র-যুব বিক্ষোভ

বিভিন্ন বেসরকারি টেলিকম সংস্থার মোবাইলে রিচার্জ মাশুল বারবার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৭ ডিসেম্বর এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও ট্রাই দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল দপ্তরের আধিকারিককে ডেপুটেশন দেয়।

এআইডিএসও নেতা আবু সাঈদ দাবি করেন, অনলাইনে ক্লাস করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে নেট প্যাক দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল বলেন, একদিকে 'জিও-র পোষ্টার বয়' নরেন্দ্র মোদি সরকার কর্পোরেট টেলিকম কোম্পানির স্বার্থে ট্রাইকে শিখণ্ডি খাড়া করে বিএসএনএলকে পঙ্গু করছে। বর্তমানে যখন রেশন, রান্নার গ্যাস, ব্যাঙ্ক সহ নানা সরকারি পরিষেবা এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা, বেকার যুবকদের চাকরির খোঁজ এবং আবেদনপত্র জমা সবকিছুই অনলাইন নির্ভর তখন বেসরকারি টেলিকম সংস্থাগুলিকে মোবাইল রিচার্জে মাত্রাতিরিক্ত মাশুল বৃদ্ধির সুযোগ করে দিচ্ছে সরকার। এই মাশুলবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com